দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 AUG 1996
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

১০৩

ভিসির পদত্যাগ এবং সন্ত্রাসকবলিত ক্যাম্পাস প্রসঙ্গে

নাসির আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির চরম অবনতির পর গত বৃহস্পতিবার ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ কয়েকটি হল থেকে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উৎখাতের আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঐসব হল বহিরাগত অস্ত্রধারীমুক্ত করা না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন বলে হুমকি দেন এবং শেষ পর্যন্ত গতকাল শনিবার তিনি পদত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ভাইস চ্যান্সেলরের এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে—তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা এবং স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হলে তাঁর পক্ষে এ ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণাই স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর অভিভাবক ভাইস চ্যান্সেলর কোন্ প্রেক্ষাপটে এমন বেদনার্ত সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করতে পারেন তাও আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু যদি সে উচ্চারণে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মমত্ব, শিক্ষা ক্ষেত্রের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং প্রকৃত আন্তরিকতার পরিচয় নিহিত থাকার বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তাহলে নানা রকম জিজ্ঞাসার জন্ম হতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এবং বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের মধ্যে হল দখলের এবং দখল টিকিয়ে রাখাকে কেন্দ্র করে যে নারকীয় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে চলেছে গত কয়েকদিন ধরে, তা কেবল দুঃখজনক নয়— চরম ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম দেয় প্রতিটি বিবেকবান মানুষের মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসাবে পদত্যাগের মতো পদক্ষেপ নেয়াটাই স্বাভাবিক। যে কারণে তিনি পদত্যাগ করলেন, তার প্রতি দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি শান্তিকামী মানুষেরই সমর্থন থাকাও স্বাভাবিক। গত কয়েকদিনে এফএইচ হল, শহীদুল্লাহ হল এবং মুহসীন হল বহিরাগত অছাত্র ও অস্ত্রধারীদের দ্বারা দখল হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চরম উৎকণ্ঠা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। যে কোন মুহূর্তে অভাবিত ভয়াল বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, লাশ পড়তে পারে ক্যাম্পাসে। এ অবস্থায় ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দাবিতে পদত্যাগ করলেন, যা এক দুঃখজনক বাস্তবতাকে চিহ্নিত করে। এ সিদ্ধান্ত সাহসীও বটে।

১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসে এবং '৯২ সালে বর্তমান ভিসি তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্বের মেয়াদকাল চার বছর পূর্ণ হবার কথা ছিল আগামী নবেম্বরে। এই দীর্ঘ ৪ বছরে কখনও বর্তমান ভিসি সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে কিংবা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এমন সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। যে সাহসের পরিচয় দিলেন তিনি পদত্যাগের মাধ্যমে। গত বছর যখন জগন্নাথ হলের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশ নারকীয় হামলা চালিয়ে বহু নিরীহ ছাত্রকে আহত করে তখনও বর্তমান ভিসির এ ধরনের সাহসী ভূমিকা প্রদর্শনের একটি অনিবার্য মুহূর্ত এসেছিল। সেদিন দেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রসহ বিবেকবান জনগোষ্ঠী তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিল বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের বিরুদ্ধে। সেদিন আহত ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত জগন্নাথ হলে ছুটে গিয়েছিল সর্বস্তরের মানুষ, হাসপাতালে ভিড় করেছিল আহত ছাত্রদের দেখতে। যতদূর মনে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি আহতদের দেখতে হাসপাতালে যাননি। তিনি জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলার ঘটনায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাও অনেকটাই ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির কাছাকাছি। পুলিশী ভূমিকার নিন্দায় এবং এ ধরনের জঘন্য ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে সেদিন যদি তিনি পদত্যাগ করার হুমকি দিতেন অথবা পদত্যাগ করতেন, তাহলে আজ তাঁর এই সাহসী ভূমিকা আর কোন প্রশ্নের উদ্রেক করতো না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে শিক্ষার্থীদের পিতৃতুল্য অভিভাবকের ভূমিকায় দেখার সুযোগ পাইনি সেদিন। যে কারণেই হোক পাইনি। কিন্তু আজ শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে হলগুলোকে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের কবল থেকে মুক্ত করার দাবিতে ভাইস চ্যান্সেলর সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি এই যে অসঙ্গতির চিত্রটি উন্মোচিত হলো এটি কোন দলীয় রাজনীতির প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি প্রকাশের জন্য উল্লেখ করিনি। করলাম এ জন্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বিশাল ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের ভিসি যখনই যিনি হবেন, তাঁকে তাঁর পদে টিকে থাকার চেয়ে তাঁর বিশাল মহিমান্বিত অবস্থানটিকে বড় করে দেখতে হবে—এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলেই যে কোন সিদ্ধান্ত অবিচল দৃঢ়তায় ঘোষণা করা সম্ভব হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে কখনও কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পরামর্শও তখন আর কোন ভিসির পক্ষে সিন্ডিকেট কিংবা কোন কর্তৃপক্ষকে দেবার প্রয়োজন পড়বে না। হবেন না সামান্যতম বিতর্কিত বাস্তবতারও মুখোমুখি।

যাই হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের দখল নিয়ে চর দখলের মতো ঘটনা এখন যেন স্বাভাবিক নিয়মে পর্যবসিত হতে চলেছে। এই অশুভ রীতি কারও কাম্য হতে পারে না। ১৯৯১ সালেও হল দখল আর প্রতিপক্ষের লড়াইয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একাধিক লাশ প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে দেশবাসীকে। আবার সেই অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ১৯৯১ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিরোধীদলীয় নেত্রী। সেদিন তিনি তাঁর সমর্থক ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম কিছুকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। বন্ধ হয়েছিল হানাহানি। কেননা প্রতিপক্ষ না থাকলে সংঘাত-সংঘর্ষ হয় কি করে? কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, '৯১-এর এপ্রিল থেকে '৯৬-এর জুন পর্যন্ত ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ছাত্রাবাস আর এখন ৬টি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হলের নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখে বিগত পাঁচ বছর ছাত্রদল তাদের প্রভাব বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। আজ যদি ছাত্রলীগও একইভাবে হল দখলের সেই ঘৃণ্য রাজনীতিরই পথ অনুসরণ করে, তাহলে তা কোন সুফল বয়ে আনবে না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে যেমন অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে; তেমনি ক্ষমতাসীন দলকেও অতীতের শিক্ষা ভুলে গেলে চলবে না। হল দখলে রেখে যদি দেশবাসীর সমর্থন পাওয়া যেত, তাহলে বিএনপিকে আজ বিরোধীদলীয় আসনে আর আওয়ামী লীগকে ট্রেজারি বেঞ্চে বসতে হতো না জাতীয় সংসদে। জনসমর্থনের মানদণ্ড হল দখল যে নয়, তা অতীতেও বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রিকভাবে দেশকে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজমুক্ত করার দৃঢ়অঙ্গীকার সামনে রেখেই বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার বার নির্বাচনকালীন তাঁর সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দৃঢ়অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এবং এখনও করছেন। গত বৃহস্পতিবারও তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক তাদের যেন গ্রেফতার করা হয়। সর্বশেষ গত শনিবার তিনি সহিংসতা এবং সন্ত্রাস দমনে দলনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কঠোর হবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ কেন কার্যকর হচ্ছে না, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

হলগুলো থেকে সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং অস্ত্র উদ্ধার অভিযান কর্মসূচী কতটা নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে, সেটাও এখন জিজ্ঞাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই, কিন্তু তাঁর নির্দেশ কী কারণে কার্যকর হচ্ছে না, সেটা এক অমীমাংসিত প্রশ্ন হয়ে আছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পুলিশ তাহলে কেন যথাযথভাবে তাদের ভূমিকা পালন করছে না? দায়িত্ব পালনের অন্তরায় কী? পত্রিকান্তরে দেখা গেছে, একটি হল ছাত্রলীগ কর্মীরা দখলের পর সেখানে অবস্থানকারী ছাত্রদল কর্মীরা জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে যোগ দিয়েছে ছাত্রলীগের সঙ্গে। অছাত্ররা প্রভোস্টের সই জাল করে আবাসিক কার্ড নিয়ে ছাত্রাবাসে উঠছে। পুলিশ চ্যালেঞ্জ করেও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের কারণে অছাত্রকে অছাত্র বলে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে তা হবে ক্ষমতাসীন দলের জন্য আত্মঘাতী। বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা অপরিহার্য।

সরকারপ্রধান স্বয়ং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলনিরপেক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তা কেন কার্যকর করবে না পুলিশ, তা আমাদের বোধগম্য নয়। একদিকে সরকার ও বিরোধীদলীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠার বৈঠক করবেন; অন্যদিকে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটবে—তা তো হতে পারে না। তাহলে কি ছাত্র সংগঠনগুলোর ছত্রছায়ায় আশ্রিত সশস্ত্র ক্যাডারদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ? যদি তা হয়ে থাকে, তাহলেও তো প্রকাশ্য ঘোষণা আসতে পারে। কারণ এ কথা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সন্ত্রাসী অস্ত্রবাজরা সব সময়ই অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পক্ষের আশ্রয়ে স্বস্তিবোধ করে এবং দ্রুত দলীয় অবস্থান বদল করে। এসব সন্ত্রাসীর কোন দলীয় আদর্শ নেই। স্থায়ী কোন দলের ঠিকানাও নেই। এরা বর্তমান সরকারের আমলেও যদি প্রশ্রয় পায়, তাহলে তা চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে।

আমরা মনে করি, হল দখলের রাজনীতি সম্পূর্ণ নির্মূল করার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে একযোগে অভিযান চালিয়ে অছাত্র উৎখাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রকৃত ছাত্রদেরকে নিয়মানুযায়ী সিট বরাদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এ মুহূর্তেই জরুরী। সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজদের গ্রেফতারের প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হবে সরকারী ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরে অভিযানের মধ্য দিয়েই। গ্রেফতারকৃত সন্ত্রাসীদের পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের অঙ্গসংগঠনের সন্ত্রাসীদেরও ছাড়া হচ্ছে না। তার পরই অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে তা হবে সর্বাধিক জনগ্রাহ্য। প্রয়োজনে '৯১-এর মতো সাময়িকভাবে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনকে নির্দেশ দিয়েও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে বিরোধীদলীয় নেত্রীরও সন্ত্রাসবিরোধী আন্তরিক সদিচ্ছার মনোভাব অনিবার্য। কারণ এক হাতে তালি বাজবে না।

এর পর কারা সন্ত্রাস করে, তা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। পুলিশকে উস্কানি দিয়ে আজ বর্তমান সংসদ নেত্রীর হাতকে মহলবিশেষ রক্তে রঞ্জিত দেখতে চায় বলে তিনি যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, তাকে আমরা অমূলক মনে করি না। কিন্তু সেই রক্তপাতের পথ পরিহার করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নিজ দলীয় ছাত্র সংগঠনে শুদ্ধি অভিযানের সূচনা করা। তার পরই স্পষ্ট হয়ে উঠবে সন্ত্রাসীদের প্রকৃত চেহারা। নৈতিকতার প্রশ্নে বর্তমান সরকার সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্ধে উঠতে পারেন আত্মশুদ্ধি অভিযানের সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে। পক্ষপাতমুক্ত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের বাস্তবতা প্রমাণিত হলে বর্তমানে উদ্ভূত সকল জিজ্ঞাসার অবসান হতে পারে। উন্মোচিত হতে পারে যে কোন ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন এবং শান্তিপূর্ণ সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে এ ধরনের সাহসী এবং নির্দয় পদক্ষেপের আর কোন বিকল্প এ মুহূর্তে নেই।